Raja N.L. Khan Women's College (Autonomous)
Sub.: Bengali, Paper- CC8, Sem.- 4th
Teacher : Dr. Bipul Kr. Mandal

অতিথি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের শেষ গল্প 'অতিথি'। এটি সাধনা'য় ১৩০২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-কার্ত্তিক সংখ্যা প্রকাশিত। গল্পগুচ্ছের অন্যান্য অনেক গল্পের মতো এই গল্পের বাস্তব পটভূমিও পদ্মাতীরের প্রকৃতি এবং মানুষ। ভিন্ন ভিন্ন মত থাকলেও আমাদের মনে হয় ২৮ জুন ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে যে পত্র লিখেছিলেন সেখানে 'অতিথি' গল্পের একটা আভাস রয়েছে। "বসে বসে 'সাধনা'র জন্যে একটা গল্প লিখছি– খুব একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। একটু একটু করে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক বর্ন ধ্বনি আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।" (১৪৪ সংখ্যক পত্র, ছিন্নপত্র) শ্রদ্ধেয় পুলিন বিহারী সেন 'একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প' বলতে 'অতিথি' গল্পের কথা বোঝাতে চেয়েছেন। 'রবিজীবনী'কার প্রশান্ত কুমার পাল ও মনে করেন, আষাঢ়ে গোছের গল্পটি হ'ল– 'অতিথি'।

* * *

'অতিথি' গল্পের কাহিনীভাগ গড়ে উঠেছে পনেরো-ষোল বছরের ব্রাহ্মণ বালক তারাপদকে কেন্দ্র করে। কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলাল বাবু যখন সপরিবারে কাঁঠালিয়া যাচ্ছিলেন তখনই তারাপদ জমিদার বাবুর নৌকায় নন্দীগ্রাম যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। মতিলাল বাবু তারাপদকে নিজেদের সঙ্গে নিলেন ঠিকই, কিন্তু তারাপদর নন্দীগ্রামে যাওয়া হল না, তারাপদ পৌঁছালো মতিলালবাবুর বাড়িতে। নদীপথে যেতে যেতে মতিলালবাবুও তাঁর পত্নী অন্নপূর্ণা এবং মাঝিদের সঙ্গে তারাপদর পরিচয় হলো। পরিচয় পর্বেই পরস্পরই নিজেদেরকে একে অপরের আপনজন ভাবলো। এই তারাপদ সাত-আট বছর বয়সেই স্বেচ্ছাক্রমে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে। তার জন্মনক্ষত্র যেন তাকে গৃহহীন করেছে। মতিলাল বাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে দুই-তিন বার বাড়ি থেকে সে পালিয়েছে, ফলত: তারাপদর আত্মীয়স্বজন ও গ্রামের লোক তার আশা পরিত্যাগ করেছে। যাত্রার আসর, পাঁচালির আসর, জিম্‌নাস্টিক দল কোনো কিছুই তাকে আটকে রাখতে পারেনি। যাত্রাদলের সকলেই তাকে ভালোবেসেছিল, তবুও তারাপদ নিজের ইচ্ছায় সেখান থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। অন্নপূর্ণা তাকে মায়ের স্নেহ দিয়েছে, মতিলালবাবু তাকে স্নান করে খেতে বলেছে, গ্রামের মানুষ তাকে আদর করে কাছে ডেকে নিয়েছে, মতিলালবাবু তার ইংরেজি শেখার ব্যবস্থা করেছে, চারুর সঙ্গে তার সম্পর্ক অল্প হলেও সোনামণির সঙ্গে তার মধুর সম্পর্ক রয়েছে, মতিলাল বাবু তারাপদকে জামাতা রূপে গ্রহণ করার জন্য সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কিন্তু যখন চারুশশীর সঙ্গে বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা হতে চলেছে তখনই দু'বছরের সমস্ত বন্ধন সে ছিন্ন করেছে। তার এই অবস্থা প্রসঙ্গে গল্পকার বলেছেন, "স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধন তাহাকে চারি দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই বাহ্মণবালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।"– এখানে 'অতিথি' গল্পের পরিসমাপ্তি।

'অতিথি' গল্পের কাহিনী ছোটগল্পের মর্যাদা রক্ষা করেছে। এই কাহিনীকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, প্রথম ভাগ হলো– নৌকায় বাসকালীন পর্ব এবং দ্বিতীয় ভাগ হলো মতিলাল বাবুর বাড়িতে থাকাকালীন পর্ব। মতিলালবাবুর সঙ্গে তারাপদর সাক্ষাতে কাহিনীর সূচনা, মতিলাল বাবুর বাড়ি থেকে তারাপদর নিরুদ্দেশ যাত্রায় কাহিনীর সমাপ্তি। গল্পের কাহিনী আকস্মিকভাবে শুরু হয়েছে। কেননা, মতিলাল বাবু জানতো না তারাপদর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটবে। আবার, কাহিনীর সমাপ্তিও আকস্মিক। কেননা, কেউই জানতো না গ্রামের হৃদয় চুরি করে তারাপদ চলে যেতে পারে। কাহিনী পুরোপুরি একমুখীনভাবে পথ চলেছে সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত। সমস্ত ঘটনা যেন তারাপদর মুখাপেক্ষী থেকেছে। তাই,

বলা চলে কাহিনীর দিক থেকে গল্পটি ছোটগল্পের ব্যঞ্জনা বহন করেছে সদর্থকভাবে।

'অতিথি' গল্পের চরিত্র সংখ্যা সীমিত। প্রধান চরিত্র তারাপদ। বাকি চরিত্রগুলি অর্থাৎ মতিলালবাবু, অন্নপূর্ণা, চারুশশী ও সোনামণি নির্মিত হয়েছে– তারাপদ চরিত্রকে পূর্ণতাদানের জন্য। এই চারটি চরিত্রের সঙ্গে তারাপদর চার রকমের সম্বন্ধ এবং সম্পর্ক কিন্তু গল্পের শেষে দেখা যায় তারাপদ কোন বন্ধনেই আবদ্ধ হয়ে নেই; গল্পে যেমন ভাবেই তার আগমন ঘটেছিল, তেমন ভাবেই তার নির্গমন ঘটেছে। তারাপদর বিচিত্র অনুভূতিকে রূপদানের জন্য এই চরিত্রগুলিকে নির্মান করেছেন গল্পকার। প্রায় দিন দশেকের নৌকা যাত্রা এবং মতিলাল বাবুর বাড়িতে তারাপদর প্রায় দু'বছর সময় অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু তারাপদ পূর্বাপর একই রকম থেকে গিয়েছে। সে সমস্ত কাঠালিয়া গ্রাম আয়ত্ত করতে পেরেছিল কিন্তু চারুশশীর ঈর্ষাকে সে জয় করতে পারেনি, হয়তো এ কারণেই সে প্রায় দু'বছর কাঠালিয়াতে থেকে গিয়েছে। গল্পের শেষে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে তারাপদ হয়ে উঠেছে অতিথি। স্বভাবতই তারাপদর জীবনের একটা পর্বই এখানে স্থান পেয়েছে– যা বিচিত্র ভাবসমন্বয়ে পল্লবিত নয়। চরিত্র রূপায়ণের নীরিখে 'অতিথি' গল্পটি সার্থক ছোটগল্পের দাবি রাখে।

ছোটগল্পের পরিসর স্বল্পতায় কাহিনী চরিত্রের আঙ্গিক সাফল্যের পাশাপাশি গল্পকারের ভাবগত বক্তব্য (thought) উপস্থাপনে 'অতিথি' সার্থক ছোটগল্প হয়ে উঠেছে। গল্পে বক্তব্য উপস্থাপনে ও গল্পকারের অভিব্যঞ্জনায় এটি সার্থকতা লাভ করেছে।

* * *

'অতিথি' গল্পের শিরোনাম ব্যঞ্জনাময়। গল্পে 'অতিথি' নামের কোনো চরিত্র দেখতে পাওয়া যায় না। এমনকি গল্পে 'অতিথি' শব্দটি একবারও ব্যবহৃত হয়নি। এইকারণে ওই শিরোনাম পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। 'অতিথি' বলতে বোঝায়, যার কোনো স্থিতি নেই – যার আগমনের কোনো তিথি নেই। ভারতীয় তথা বাংলা-সংস্কৃতিতে 'অতিথি' সম্পর্কীত ধারণা অত্যন্ত স্বচ্ছ। তারাপদর কোনো স্থিতি নেই এবং তারাপদ এই গল্পে অনাহুতের মতো মতিলাল বাবুর সান্নিধ্য এবং আশ্রয় পেয়েছে। মতিলাল বাবু ও অন্যান্য সকলে তারাপদর প্রথম সাক্ষাৎ পেয়েছে অতিথির মতো; কিন্তু প্রত্যেকেই তারাপদকে ভালো বেসেছে আপনজনের মতো। স্বভাবতই এই গল্পের কোনো ঘটনার সঙ্গে 'অতিথি' শব্দের সাযুজ্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে, 'অতিথি' শব্দটি যে সকল চরিত্রের মধ্যে কেবল তারাপদকে ব্যঞ্জিত করে তা বুঝতে আমাদের সমস্যা হয় না। 'অতিথি' গল্পের অতিথি তারাপদ। তারাপদ অতীতেও কোথাও স্থিতি থাকতে পারেনি– কখনো যাত্রার আসর, কখনো জিমন্যাস্টিকের দল, কখনো পাঁচালির আসর প্রকৃতির সন্তান স্থিতিহীন তারাপদকে স্থিতি দিতে পারেনি। তারাপদর জীবনছন্দই এই গল্পের একমাত্র বর্ণিতব্য বিষয়। তাই, ব্যঞ্জনাধর্মী এই শিরোনাম পূর্ণ মাত্রায় সার্থক মনে হয়।

* * *

'অতিথি' গল্পের প্রধান চরিত্র, নায়ক চরিত্র তারাপদ। সাধারনতঃ আমরা চরিত্রের দু'টি দিক অবলোকন করে থাকি– একটি হলো চরিত্রে বহিঃরঙ্গ অবয়ব ও ঘটনা প্রবাহ এবং দ্বিতীয়টি হলো চরিত্রের অন্তরঙ্গ স্বরূপ। অবয়ব ও ঘটনাপ্রবাহ সকল পাঠকই একই রকমভাবে পর্যবেক্ষণ করে থাকে কিন্তু ব্যক্তি চরিত্রের অন্তরঙ্গ স্বরূপ বা inner reality উপলব্ধি করতে পারাই একনিষ্ঠ অনুভূতিশীল পাঠকের কাজ। পনেরো-ষোল বছরের পিতৃহীন ব্রাহ্মণবালক তারাপদ। গল্পকার তার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে, "গৌরবর্ণ ছেলেটিকে বড়ো সুন্দর দেখিতে। বড়ো বড়ো চক্ষু এবং হাস্যময় ওষ্ঠাধরে একটি সুললিত সৌকুমার্য প্রকাশ পাইতেছে। ..... কোনো শিল্পী যেন বহু যত্নে নিখুঁত নিটোল করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন।" এই সৌম্যকান্তি সুদর্শন ব্রাহ্মণবালক পিতা-মাতার চতুর্থ সন্তান, স্বেচ্ছায় সাত-আট বছর বয়সেই ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। গ্রামের সকলের আদরের ছেলে যাত্রার দলের সঙ্গে পালিয়েছিল, সবাই মিলে তাকে খুঁজেও এনেছিল কিন্তু কোনো বন্ধন, "এমন-কি স্নেহ বন্ধনও তাহার সহিল না; তাহার জন্মনক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে।" এভাবেই তারাপদ হরিণ শিশুর মতো বন্ধনভীরু হয়ে মুক্ত বিহঙ্গের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে। নন্দীগ্রাম যাত্রার পূর্বে সে জিম্‌ন্যাস্টিকের দলে ছিলো; নন্দীগ্রামের যাত্রাপথে মতিলালবাবু, অন্নপূর্ণা ও চারুশশীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। আর,

মতিলালবাবুর বাড়িতে থাকার সময় সোনামণি, সোনামণির মা এবং গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টারের রামরতন বাবুর সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কোন সামাজিক সম্পর্ক-বন্ধনে তাকে আটকে রাখা যায়নি।

তারাপদ যা পায়, তাই খায়; সকল দিন খায়ও না। দুধ খেতে তার ভালো লাগে না। সে জঠর জ্বালায় পীড়িতবোধ করে না– এ বিষয়ে সে উদাসীন কিন্তু "দৃষ্টির পিপাসা" তার কিছুতেই নিবৃত্ত হতো না। সে নদীবক্ষে নৌকারোহী অবস্থায় মুগ্ধ চিত্তে বিশ্বপ্রকৃতি অবলোকনে ব্যস্ত ছিল, ফলতঃ নন্দীগ্রামে তার অবতরণ করা হয়নি। আসলে নন্দীগ্রাম যাওয়াটা ছিলো তার উপলক্ষ কিন্তু লক্ষ্য ছিলো বিশ্বসৌন্দর্য আস্বাদন করা। সে সবার মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু চারুশশীর ঈর্ষা সে জয় করতে পারেনি; যদিও কখনো কখনো চারুশশী তার কৃতকর্মের জন্য তারাপদর কাছে অনুশোচনা প্রদর্শন করতে চেয়েছে– তারাপদ তা হাস্য সহকারে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। এই তারাপদর বিয়ের বন্দোবস্ত যখন প্রায় পাকাপাকি হতে চলেছে তখনই সে কাঁঠালিয়া ত্যাগ করেছে। এ সবই জীবনচঞ্চল বালক তারপদর জীবনের বর্হিঃরঙ্গ ঘটনাপ্রবাহ। গল্পকার এভাবেই চরিত্রকে কল্পনানুগ বাস্তবরূপ দান করেছেন।

প্রকৃতির রসসম্ভোগ ঘটেছে 'অতিথি' গল্পে। তারাপদ এই রসসম্ভোগ করেছে। তারাপদ প্রকৃতিপ্রাণ, মুক্ত মন, spirit of the nature, তাকে কখনো জোর করে আটকে রাখা যায় না। তারাপদর পথ চলাতেই আনন্দ। তার এই স্থিতিহীনতা প্রকৃতির সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতি এবং তারাপদ একাত্ম। মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব ধরা পড়েছে ছিন্নপত্রের ৩৮ সংখ্যক পত্রে। তিনি লিখেছেন, "পাড়াগাঁয়ে এলে আমি মানুষকে স্বতন্ত্রভাবে দেখিনে। যেমন নানা দেশ দিয়ে নদী চলেছে, মানুষের স্রোতও তেমনি .... নদীর মতোই চলেছে– তার একপ্রান্ত জন্ম শিখরে, আর এক প্রান্ত মরণসাগরে।" তারাপদ এই নদীর মতো, প্রকৃতির মতো প্রবহমান, সে "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনোখানে"র সন্ধানে বারংবার পথে নেমেছে। পথই তারাপদকে পথের সন্ধান দিয়েছে; সমস্ত বন্ধন সে ছিন্ন করেছে। বনের পাখির মতো তারাপদ যেন বলতে চেয়েছিল "আপনা ছাড়ি দাও মেঘের মাঝে একবারে।" সত্যিইতো তারাপদ এক্কেবারে সকল বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে। দু'বছর ধরে স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে মতিলালবাবু-অন্নপূর্ণা, রাগ-অনুরাগের দ্বন্দ্বে চারু এবং সখ্য-বাঁধনে সোনামণি তারাপদকে বাঁধতে চেয়েছিলো কিন্তু তারাপদ সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে চলে গিয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্র-কবিসত্তার নিবিড় সম্পর্কের কথা সর্বজনবিদিত। রবীন্দ্র মনন বারবার প্রকৃতির সঙ্গে নাড়ীর যোগ অনুভব করেছে। তারাপদর প্রকৃতিপ্রাণতা যেন রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় ব্যক্ত হয়েছে, "এই পৃথিবীটি আমার অনেকদিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো নতুন; আমাদের দু'জনকার মধ্যে একটা গভীর ও সুদূরব্যাপী চেনাশুনা আছে।"– সন্তান যেমন নাড়ীর টানে মায়ের কাছে ফিরে যায়, প্রকৃতির সন্তান তারাপদ সব বন্ধন ছিন্ন করে প্রকৃতি মায়ের স্নেহরসসুধা পান করবার জন্যে নতুন পথে পাড়ি দিয়েছে। জীবন-রূপকার, জীবনের কারিগর রবীন্দ্রনাথ তারাপদকে সৃজন করেছেন দ্বৈতরূপকে– মানবসন্তান ও প্রকৃতির সন্তান তারাপদ। তারাপদ অনন্য– সাধারণের সঙ্গে তার হিসেব মেলে না।

'অতিথি' গল্পের চারুশশী পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। গল্পে প্রথম যখন চারুকে পাওয়া যায় তখন তার বয়স নয় বছর, গল্পের শেষে তার বয়স এগারো। চারুশশী পিতা মতিলালবাবু, মাতা অন্নপূর্ণার একমাত্র সন্তান। গল্পকারের ভাষায় চারু, "এই ক্ষুদ্র মেয়েটি একটি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা।" সত্যিই তো চারুশশী সাধারণের অবোধ্য। সে সমস্ত দিন রাত্রিতে, সমস্ত কাজে-অকাজে তারাপদর বিরুদ্ধাচারণ করেছে কিন্তু, "তারাপদ মধ্যাহ্নে যখন নদীতে স্নান করিতে নামিত, পরিপূর্ণ জলরাশির মধ্যে গৌরবর্ণ সরল তনুদেহখানি.... তরুন জলদেবতার মতো শোভা পাইত" তখন চারু আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে পারতো না। চারু স্নানরত তারাপদকে দেখবার জন্য সবার অজান্তে অপেক্ষা করে থাকতো। তারাপদর প্রতি চারুর তীব্র ঈর্ষা ও তীব্র আকর্ষণে আমরা হতবাক বোধ করি কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বালিকাবস্থাতেও নারীদের অন্তররহস্য ভেদ করা সুকঠিন।" ঠিকই তো চারু অগম্য, চারু অবোধ্য।

চারুশশী বর্হিঃবিশ্বে তারাপদর প্রতি তীব্র ঈর্ষাকাতর, অন্তরে সে তারাপদর একনিষ্ঠ অনুরাগী। সে তার সখী বিধবা সোনামণিকে কোনোভাবেই তারাপদ ধারে পাশে দেখতে পারে না। হয়তো বা সোনামণিকে চারু নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী

ভেবেছে এবং হয়তো বা এই কারণেই তারাপদর প্রতি তীব্র অভিমানের বশবর্তী হয়ে তারাপদ বাঁশি পদাঘাতে ভেঙে দিয়েছে। চারু মনে মনে নিজেকে তারাপদর একাধিকারী ভাবে, সেখানে সে সোনামণির উপস্থিতি চায় না। এই চারু জিদ্ ধরে ইংরেজি পড়তে চায়, তারাপদ খাতা বই নষ্ট করে, বই খাতায় কালি মাখিয়ে দেয়; আবার কখনো বলে "আমি আর কখনো খাতায় কালি মাখাব না", কখনো অনুতাপের সুরে বলে, "তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আর আমি এমন করব না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি খেয়ে যাও।"– এভাবেই চারুশশীর বয়স দু'বছর বৃদ্ধি পেয়েছে। গল্পের শেষাংশে চারুশশী এগারো বছর বয়সী কন্যাসন্তান, যার বিবাহের উদ্যোগ চলছে কিন্তু রায়ডাঙার বাবুরা চারুকে দেখতে এলে চারু কিছুতেই ঘরের বাইরে আসেনি। কিন্তু কেন চারু ঘরের বাইরে এলো না ? হয়তো বা ঈর্ষার আড়ালে তারাপদর প্রতি তার মনোভাবের পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিল– কে বলবে! এইভাবে গল্পকার চারুর বর্হিঃরঙ্গ কাজকর্মের মধ্যে মধ্যে মনস্তাত্ত্বিকতার অনুপ্রবেশ সার্থকভাবে ঘটিয়েছেন বলে আমাদের মনে হয়। স্বল্পপরিসরে চারু জীবন্ত, চারু বাস্তব, চারু সার্থক।

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী :

ক. প্রতিটির মান - ১০ নম্বর।

১. 'অতিথি' গল্পের শিরোনাম কতখানি শিল্প সার্থক– তা আলোচনা করো।

২. তারাপদ চরিত্র আলোচনা করো।

৩. ছোটগল্প হিসেবে 'অতিথি' গল্পের মূল্যায়ণ করো।

খ. প্রতিটির মান – ৫ নম্বর।

১. চারুশশী চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করো।

গ. প্রতিটির মান – ২ নম্বর।

১. কবে, কোন পত্রিকায় 'অতিথি' গল্পটি প্রকাশ পেয়েছিল ?

২. মতিলাল বাবু কোথাকার জমিদার ? তার মেয়ের নাম কী ?

৩. তারাপদ কতদিন কাঠালিয়া গ্রামে ছিলো ? তার কোথায় যাবার কথা ছিলো ?

৪. গল্পের সূচনাকালে তারাপদ ও চারুশশী বয়স কত ছিলো ?

৫. তারাপদ তার পিতা মাতার কততম সন্তান ? তারাপদর ভাই-বোনের সংখ্যা লেখো।